Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 23-28
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিমল সিংহের ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনা

মলয় দেব
সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা

Abstract

Bimal Singha was a one of the renewaned narrative writer in the second half of the twentieth century of Tripura. He was directly involved from his college life with the communist party and its movements. His creative ideas and thoughts was linked with political idols in a very closely manner. He brought the practical life and society of the people of Tripura in his writing like novel and short stories. Being a political activist he has shown the society and life of the tribes of the hilly areas and the plane areas in his narrative through view of a Marxist. so, therefor many of the political views and ideologues has been reflected in his narrative directly or indirectly. The reflection of the political consciousness of the writer Bimal Singha in his short stories will be described in a brief manner.

Key words: Common people, society, short story, marxism, political consciousness.

ত্রিপুরার এক অগ্রগণ্য কথা সাহিত্যিক বিমল সিংহ। তিনি ছিলেন বিনয়ী, বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শিল্পী। ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ের মাটি ও মানুষকে রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি যেভাবে দেখেছেন, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাকেই সৃজনাত্মক রূপ দিয়েছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ের দরদি শিল্পী বিমল সিংহের জন্ম ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। অধুনা ত্রিপুরার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার রুপসাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, মাতা পূর্ণিমা সিংহ। স্কুল জীবনেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদারের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে বামপন্থী রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। ১৯৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। তারপর থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তিনি নিরলসভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। সত্তরের দশকে ত্রিবান্দ্রমে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তিনি ত্রিপুরার প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে সেখানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে কমলপুর আসন থেকে সিপিআই (এম) এর প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটে জয়ী হন। তারপর যথাক্রমে ১৯৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৮ খ্রিঃ তিনি ত্রিপুরার বিধনসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ বিমল সিংহ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন।

বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের একজন মানুষ হিসাবে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন, তেমনি ত্রিপুরার নিকট অতীতের ঘটনাবলী বিশেষ করে ‘জনশিক্ষা সমিতি’ ও ‘উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ’ এর জনমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। “এই দুই সংগঠনের মুক্তিকামী আন্দোলন সামন্ততন্ত্র বিরোধী প্রতিটি শুভচেতনা সম্পন্ন সমাজ

সচেতন মানুষকে সেদিন একদিকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি অন্যদিকে নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, কুঅভ্যাসে ভরা, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিল। সাম্যবাদে বিশ্বাসী বিমল সিংহ স্ব-জাতির এবং ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল রচনায় এই দুই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষের লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির যুগলবন্দি রচনা করেছেন।"[১] মার্ক্সীয় চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী বিমল সিংহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড় চষে বেড়িয়েছেন। এই সূত্রে ত্রিপুরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা মূর্ত রূপ পেয়েছে তাঁর 'আলোর ঠিকানা', 'মনাইহাম', 'লংতরাই', 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা', 'করাচি থেকে লংতরাই' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ কোন রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত না হলেও এগুলিতে কম-বেশি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর রচনায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে শাসকের ও শাসিতের সম্পর্ক, বিরোধ, সংঘর্ষ, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। রাজনীতির সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিমল সিংহ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে সমাজ পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, প্রচলিত জীবন চর্যা, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন, প্রয়োজনে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের কথাকে বাণী রূপ দিয়েছেন। জনমুখী, কল্যাণকামী নিয়ম-কানুন ও বৈষম্য বর্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের চেষ্টাও তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিত। 'লংতরাই' উপন্যাসের পরিণতিতে তাঁর এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব ।

বিমল সিংহ তাঁর 'ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে' গল্পে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেই সঙ্গে এই গল্পে দেশভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কালোবাজারী, পণপ্রথা, মহাজনী শোষণ প্রভৃতি ঘটনার অবতারণা করে তাঁর সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বজাতির ঐতিহ্য নিয়ে লেখা তাঁর এই গল্পের পটভূমি নির্মিত হয়েছে কমলপুরের জাংথুম গ্রামকে কেন্দ্র করে। এই গ্রামে অধিকাংশ মণিপুরিরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। চাষের ফসলের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন চলে। ইঙেল্‌লেইর বাবা ছিলেন একজন বর্গাচাষি। কিন্তু তিনি তার মেয়েকে মশাউলি গ্রামের ভেটবা বুড়ির ছেলে ধনবাবুর কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। ধনবাবু "চাষবাদে যেমন মৃদঙ বাজানোতেও ওস্তাদ। ঘরের ভাত, পুকুরের মাছ।"[২] এক ভরন্ত চাষি পরিবারে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর পীড়নে সব পাল্টে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে ভাঙনের সূচনা করেছিল, তার ঢেউ নিভৃতে নাড়িয়ে দেয় গ্রামাঞ্চলের ভিতকেও, চারপাশে দেখা দিল অভাব অনটন। তার পাশাপাশি দেশভাগের মত রাজনৈতিক ঘটনার ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলা থেকে অনেক বাঙালি রিফিউজিরা এসে ঘর বাঁধতে শুরু করে পার্বত্য ত্রিপুরায়। তারা চড়া দামে কিনতে থাকে মণিপুরিদের জায়গা জমি। দ্রুত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মণিপুরিদের সমাজজীবনে দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। ধনবাবুর মত সম্পন্ন গৃহস্থ চাষিকে রূপান্তরিত হতে হয় বর্গাচাষিতে। ধনবাবু তার মেয়ে রীতার বিয়ে ঠিক করে জীপ ড্রাইভার রাতাছড়ার চন্দ্রজয় সিংহের সঙ্গে। বরের দাবি বিয়ের থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় এর সঙ্গে একটি ঘড়ি। একথা শুনে কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা ধনবাবুর মাথায় হাত। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে ধনবাবু নিজের বসতবাড়ীর পুরানো দলিল মহাজন রমাপতির গদিতে বন্ধক দিয়ে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এক সম্পন্ন পরিবারের আর্থিক অবস্থার করুণ পরিণতি প্রতিকী চিত্রকল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পে এভাবে "রীতার বিয়েতে সানাই বাজল না। বাদক আসেনি। রীতার মা ঝাঁপি খুলল না... রীতা হাসলও না কাঁদলও না। ... আমের ডালে একটা কোকিল থেকে থেকে কান্নার মতো সুরে ডেকে যাচ্ছিল।"[৩]

পূর্ববর্তী গল্পের সূত্র ধরে রচিত 'আলোর ঠিকানা' গল্পে এই চাষি দম্পতির সংগ্রামী দিনের কথা ধ্বনিত হয়েছে। মহাজন, গ্রাম প্রধান, তহশীলদার প্রভৃতি মধ্যসত্ত্বভোগীদের অন্যায় অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে লেইমণি

গ্রামবাসীদের সচেতন করতে চেয়েছে। তার প্রচেষ্টায় জাতি উপজাতি নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে গণমুক্তি পরিষদের ছত্রছায়ায়। যেখানে সমবেত জনগণ সংকল্প গ্রহণ করে এলাকায় এলাকায় শক্তিশালী গণসংগঠন গড়ে তোলার এবং মহাজনের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে আনার। 'লংতরাই' উপন্যাসের হাসমাই রিয়াং ও 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা' উপন্যাসের মুক্তা জমাদারও এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল।

বিমল সিংহের 'ধীরে বহে ধলাই' গল্পের মূল বিষয় দেশভাগ পরবর্তী নিরীহ মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি। বৃদ্ধ রুস্তম আলী তার কন্যা সোফিয়াকে নিয়ে ধলাই নদীর তীরে বসবাস করত। গ্রামের দরিদ্র হিন্দু যুবক নুনিয়ার সঙ্গে সোফিয়ার প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রামের মাতববররা তাদের এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। মাতবরদের কুপ্ররোচনায় মহাজনের লোকেরা প্রথমে রুস্তমকে বাজারে মারধর করে ও পরে তার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে তাকে দেশছাড়া করে। অন্যদিকে রুস্তমকে বাঁচাতে গিয়ে নিরপরাধ নুনিয়াকে তিনবছর জেল খাটতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নুনিয়া গ্রামবাসীর কাছ থেকে সোফিয়া ও রুস্তমের পূর্ব পাকিস্তান চলে যাওয়ার কথা জানতে পেরে সেও তাদের সন্ধানে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। "এক গভীর আশাবাদী মন নিয়ে মানবতার উজ্জ্বল যাত্রাপথকে চিহ্নিত করেছেন গল্পকার এই গল্পের মধ্য দিয়ে। তার সঙ্গে ধনহীন, ক্ষমতাহীন, নিচুঁতলার মানুষের উপর ক্ষমতাবান মহাজন, সমাজের মাতব্বরদের অন্যায় আচরণের তীব্র নিন্দাও ধ্বনিত হয়েছে। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শুদ্ধ সম্পর্কগুলিকে ক্ষুদ্র-সাম্প্রদায়িকতার লেবেল সেঁটে সমূলে উৎপাটিত করার কৌশল যে কতো বড়ো মিথ্যা প্ররোচনার সামিল – এই গল্পটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"[৪]

'গোলাপের ছেলেবেলা' গল্পে কথাসাহিত্যিক বিমল সিংহের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোলাপের ঠাকুরদা মানভূম থেকে ত্রিপুরার দারাগাঁও বাগানে চা-শ্রমিক হিসাবে আসেন। কোম্পানি তাকে সামান্য জমিও দিয়েছিল চাষ করার জন্য। তাদের দুটো বলদ ও দুটো দুধের গাইও ছিল। কিন্তু সংসারের প্রতি উদাসীন মাদকাসক্ত বাবা ধীরে ধীরে সবকিছু বিক্রি করে দেয়। দিনভোর বাগানে পাতা তোলার কাজ সেরে গোলাপের মা তার স্বামীকে আক্ষেপের সুরে বলে "সংসারে কি আছে কি নাই চোখে কোনদিন কুছু নাই ভালছে! তুই মরছিস মরছিস লেরকা বাচ্চা গিলান মরবেক কেনে। হামেশা মদ খাই করে দেহীটা শেষ করে ফেললে।"[৫]

ছেলেবেলায় গোলাপ নেংটি পরে খালি গায়ে দুধ দিতে দুধের বালতি নিয়ে স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে যেত। স্টেশনমাশটারের বাড়িঘরের আসবাবপত্র ও তার ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় দেখে সে তাদের সঙ্গে তার অবস্থার তুলনা করত। স্টেশনমাস্টারের ছেলেমেয়েরা তার চুটকি ধরে টানত। বাবার কাছে চুটকি কেটে দেবার আবদার করলে বাবা সস্নেহে বলত ওটা হিন্দু ধর্মের নিয়ম। কৌতুহলী বালক গোলাপ তখন তার বাবার কাছে জানতে চায় স্টেশনমাস্টারের বাচ্চাদের তবে কি জাত? বাবা বলত 'ওরা হিন্দু তবে বাবু' । তখন তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় এই পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান ও বাবু এই তিনটি জাতই রয়েছে। গোলাপের এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে লেখক তৎকালীন সামাজিক বৈষম্যের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গোলাপের ছেলেবেলায় বাড়িতে দুধের গাই থাকা সত্ত্বেও তাদের খাবার জন্য দুধ জুটত না। মা সারাদিন চায়ের পাতা তোলায় ব্যস্ত থাকার দরুন নিজের সন্তানকেও সময়মত বুকের দুধ দিতে পারত না। ফলে ধীরে ধীরে গোলাপ অসুস্থ হয়ে পড়লে গোলাপের মা বাগানের সাহেবকে ছুটির জন্য আবেদন জানালে সাহেব নামঞ্জুর করে দেয়। এর মধ্যে দিয়ে বাগিচা শ্রমিকদের নির্মম বাস্তব রূপটি ধরা পড়ে। এই নিরক্ষর চা শ্রমিকরা নানা ধরণের সংস্কারে বিশ্বাস করত। গোলাপও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। সে মনে মনে ভাবত ঈশ্বর কেন তাদের দুবেলা দুমুঠো খাবারের ব্যবস্থা করে দেননা, তাদের ধনী করে পৃথিবীতে পাঠান না। এ বিষয়ে একদিন বাবার কাছে জানতে চাইলে বাবা তাকে বলে, জন্মের দিনই মানুষের কপালে ঈশ্বর ধনী গরীর লিখে দেন। বাবার কাছে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে গোলাপ তাই ছোট বোন শিবদাসীয়ার জন্মের সময় আড়ালে লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করে ভগবান শিবদাসীয়ার কপালে সত্যিই

কিছু লিখে দিয়ে যান কিনা। কিন্তু সে এরকম কিছু না দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে –"দুটি পাতা একটি কুড়ি তোলার জন্য দুটি কচি হাত এল অগণিত আধ পেটা মানুষের পৃথিবীতে।"[৬] সামাজিক বৈষম্য, শোষণ পীড়ন কিভাবে গোলাপের মনে প্রতিবাদী চেতনা সঞ্চারিত করেছিল, লেখক এই গল্পে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন।

রাষ্ট্রযন্ত্র তার প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে নিরীহ মানুষদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাদের কি ভাবে হাজতে ভরে রাখত তার বাস্তবানুগ ছবি পাওয়া যায় 'জাবেদ আলীর আজান' গল্পে। এই গল্পের পটভূমি নির্মিত হয়েছে ১৯৭১ খ্রিঃ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর মহকুমার সাব জেলের 'হাজতী' জাবেদ আলীকে কেন্দ্র করে। 'পাকিস্তানের দালাল' এই অজুহাতে তাকে জেলে হাজত খাটতে হচ্ছে। কবে বিচার হবে, কবে জামিন পাবে কিছুই তার জানা নেই। এ অবস্থা শুধু তার ক্ষেত্রে নয়, জেলের অন্যান্য আসামিদেরও। বেতনভোগী সরকারী কর্তারা এখানে সর্বেসর্বা। ক্ষমতার জোরে তারা তাদের প্রতাপ জাহির করার জন্য এই সকল আসামিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন যেমন চালায় তেমনি, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করে। জেলের ভিতরে কয়েদিদের যে খাবার দেওয়া হত তাতে তাদের খিদে মিটত না। তাই তারা আটার গোল্লা চুরি করত। এ নিয়ে আবার তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও হত। জাবেদের মুখে বিদুরবাবু এই ঝগড়ার কারণ জানতে পেরে অবাক হয়ে যান। তিনি শরণার্থী শিবিরের মানুষদের হয়ে হাকিম, দারোগা প্রমুখের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করায় তাকে 'রাস্ট্র বিরোধী' কেসে জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। বিদুরবাবুর মত জাবেদ আলী লেখাপড়া জানা মানুষ নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তার ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক বোধ গড়ে ওঠেছে। সে জানে, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার কাছে তাদের মত মানুষেরা কত দুর্বল, কত অসহায়। তাই তারা রাষ্ট্র ও তার প্রশাসনের অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে। প্রসঙ্গক্রমে জাবেদ বিদুরবাবুকে তার বহুবার বিনা অপরাধে জেল খাটার কথা বলে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময়, কাশ্মীর যুদ্ধের সময় সীমান্তবর্তী এলাকার এই সংখ্যালঘু মানুষটিকে হাজত খাটতে হয়েছে। এবারে পাকিস্তানের দালাল সন্দেহে বাজার থেকে তাকে পুলিশ ধরে এনেছে। বাড়িতে সে খবর পর্যন্ত দিতে পারেনি।

বিন্দুবাবু দৃঢ়চেতা সহানুভূতিশীল বিবেকবান মানুষ। তিনি জেলের হাজতিদের ওপর পুলিশের অন্যায় আচরণের যেমন প্রতিবাদ করেন তেমনি, রাত আটটার পর তাদেরকে নিয়ে বসেন। গল্পচ্ছলে মানুষের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগ্রত করতে চান। জাবেদ ও পদ্ম রাঙ্খল বিন্দুবাবুর মুখে সমসের গাজি ও রতনমণি রিয়াং এর বিদ্রোহের কথা মোহগ্রস্তের মত শোনে। এক বছর পর জাবেদ জেল থেকে বেরিয়ে এলে সে সম্পুর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে যায়। বিন্দুবাবুর উজ্জীবনী মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে গ্রামের অসহায় মানুষের মধ্যে সে এই চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে চায়। মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থেকে তাদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা নেয়। গ্রামের গৃহহীনদের মাথা গুঁজার আস্তানা দেবার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে বিলাসছড়ার পাহাড়ি এলাকার অনাবাদী জমি আবাদ করে। বনদপ্তরের বাবুরা এসে তাদের দা-কুড়াল কেড়ে নিয়ে গেলে জাবেদ সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বন দপ্তরে হাজির হয়। তারপর পাহাড়ের ঢালুতে, লুঙ্গার কোণায় ধীরে ধীরে বিশ বাইশটি ঘর গড়ে ওঠে। এরকম সময়ে ঠিকাদার রবিবাবু অর্থ ও ক্ষমতার জোরে জরিপ বিভাগের আমিন, তহশীলদার, নায়েবকে দিয়ে আবাদি জমি ও বসত বাড়িগুলি জরিপের আওতায় নিয়ে আসে। গৃহহীনদের নামে নোটিশ জারি করা হয়। জাবেদ সংঘটিতভাবে এই নোটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাদের প্রতিবাদী মানসিকতার কাছে তহশীলদার, নায়েবকে মাথা নত করতে হয়। কিন্তু আইনের গোলক ধাঁধায় ফেলে তথাকথিত শিক্ষিত স্বার্থপর রবিবাবুরা জাবেদ আলীর বিরুদ্ধে বলপূর্বক জমি দখলের মামলা করে। নিজের লালসা নিবৃত্তির জন্য রবিবাবু পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় গৃহীহীনদের ঘরে আগুন দিলে জাবেদ নদীর পারে ছুটে যায়। গ্রামবাসীদের ডাকাডাকি করে জড়ো করে নিজের উঠোনে একটা লাঠি নেবার জন্য ঢুকলে মহেশ দারোগার হাতে ধরা পড়ে। তখন 'ভোর' হয় হয়। এই প্রতীকী 'ভোরে'র ব্যঞ্জনাতেই গল্পটির মূল তাৎপর্য যেমন ধ্বনিত হয়েছে তেমনি, গল্পকারের রাজনৈতিক মতাদর্শও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষ অভিবাসনের উদ্দেশ্যে এলে স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ধীরে ধীরে আদিবাসীরা আরো প্রান্তীক হতে থাকে। ফলত 'এথেনিক হোমল্যাণ্ডের' দাবি জোরদার হয়। মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ, সংস্কৃতির মিশ্রণের জায়গায় স্পরস্পরের মধ্যে দেখা দেয় হিংসা, বিদ্বেষ, বৈরীভাব। যার বহিঃপ্রকাশ ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের ত্রিপুরার মান্দাই দাঙ্গা। এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বিমল সিংহ রচনা করেছেন তাঁর 'বসনের ঠাকুরমা' গল্পটি। এই গল্পে ললিত রূপিণীর জুমচাষি থেকে দিন মজুরে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি, দেশভাগের বলি হয়ে মেঘনার পাড় থেকে ছুটে এসে পাহাড়ি ত্রিপুরার মংকুরুই সাধুপাড়াতে সুরেন দাসের বসত গড়ার বর্ণনাও রয়েছে। ললিত –সুরেনের পরিবার আসাম আগরতলা বর্ডার রোডের কাজে চলে গেলে ললিতের ছোট ছেলে বংশী সুরেনের মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। ধীরে ধীরে বসন তাকে ঠাম্‌মা ডাকতে শুরু করে। পাশাপাশি স্বহাবস্থানের ফলে এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই মানুষগুলোর মধ্যে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের এই মানবিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে দিতে চায়। এমনই এক উত্তাল পরিস্থিতিতে বসনকে কোলে নিয়ে বৃদ্ধ ঠাম্‌মা পালিয়ে বাঁচতে চাইলে মানুষ রূপী হিংস্র নেকড়ের হাতে বর্শা বিদ্ধ হয়ে তাদের প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। দিন তিনেক পরে পুলিশের লোক একই বর্শায় বিদ্ধ অবস্থায় বসন ও বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অবধি বৃদ্ধা ছোট্ট বসনকে তার বুকে জড়িয়ে রেখেছিল। আর এজন্যই মানবতার এক শাশ্বত কাহিনি হয়ে এই গল্পটি পাঠকের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।

'রাইমা উপত্যকার উপকথা' গল্পটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির জন্য শতশত আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করে কিভাবে ছিন্নমূল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গণ্ডাছড়ার রাস্তা, পুল তৈরি করার কাজ তখন মাত্র শুরু হয়েছে। ঠিকাদার বাবুরা লোকজন সমেত এখানে এসে ক্যাম্প করেছে। মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও ভীড় জমিয়েছে। ব্যবসায়ীর হাতে হাতি-খেদায় বুনো হাতি ধরা পড়লে বুদ্ধিরাম সরল মনে সেখানে হাতি দেখতে যায়। হাতি দেখতে যাবার অপরাধে সহজ সরল এই মানুষটিকে ঠিকেদার চাল চোর বানিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর তক্‌কী রায় পাহাড়িদের ঐক্যবদ্ধ হবার অনুরোধ জানিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে– "সত্যকে মিথ্যা বানাতে এ বাবুদের জুড়ি নেই। ওরা আমাদের পাহাড়ীদের ঠকিয়ে বাবু বনেছে। জুম কাটা আইন করে বন্ধ করেছে। পাহাড়ের শুকনো লাকড়ি আনতে গেলে অদেরকে মাশুল দিতে হয়।"[৭] তাকে আরও বলতে শোনা যায় "...আমাদের মধ্যে যত ঝগড়াই থাক তবু বিপদ আপদের সময় আমরা এক হয়ে চলব।"[৮] তার এই উক্তির মধ্য দিয়ে অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার এবং নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এক গভীর প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। তাই রাইমা উপত্যকার অনতি দূরের জলপ্রপাতের বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে সরকার থেকে আদিবাসীদের জমি ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হলে তক্‌কী রায়ের নেতৃত্বে জুমিয়া চাষি ও পার্শ্ববর্তী বাঙালি গ্রামের মানুষেরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের পথ বেছে নেয়। জন সমুদ্রের ঢেউয়ের কছে পুলিশ প্রশাসন যে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় বিমল সিংহ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তার মানস সঞ্জাত চরিত্র তক্‌কী রায়ের মধ্য দিয়ে তিনি এই বামপন্থী চিন্তাধারাকে অভিব্যক্ত করেছেন।

আশির দশকে ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্ট উগ্রপন্থী সমস্যাকে বিষয় করে বিমল সিংহ তাঁর 'বিপথের পথিক' গল্পটি রচনা করেন। গল্পটিতে এই সমস্যার আর্থ-সামাজিক কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি গল্পটিতে এই জ্বলন্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও পরোক্ষভাবে মালসুমার উগ্রপথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মালসুমা আত্মসমর্পণ করে মূলস্রোতে ফিরে এলে কমান্ডার তা মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। তাই সে খেপেঙরায়কে নির্দেশ দেয় দলছুট মালসুমাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু খেপেঙরায় মালসুমার কোলে বসা ছেলেকে দেখে তার উগ্র পাশবিক আচরণের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মত নরম পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মালসুমাকে নিজের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দিয়ে যায় এবং সঙ্গীদের ভুল পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। বিমল সিংহ এই জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় ত্রিপুরা

বিধানসভায় তাঁর শেষ ভাষণে। এই ভাষণে তিনি বিপথগামীদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান- "উগ্রপন্থীরা ভুল পথ ছাড়ুন। ত্রিপুরার উন্নয়নে হাত মেলান। আমি আশাবাদী আপনাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে।"[৯]

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় কথা সাহিত্যিক বিমল সিংহের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, উচ্চবিত্তশ্রেণির আগ্রাসী মনোভাব, মহাজনী শোষণ, জাতপাত, ধর্মীয় গোড়ামি, সংকীর্ণ উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার আলোকে বিচার করেছেন। শুধু তাই নয় গণমুক্তি পরিষদের ইতিবাচক ভুমিকা কিভাবে ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে সেই ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। যা তার ছোটগল্পের রাজনৈতিক গুরুত্বকে ঋদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিমল সিংহ মার্ক্সীয় জীবনবীক্ষার আলোকে তাঁর গল্পগুলি রচনা করেছেন। ফলত তাঁর গল্পের বয়ানে রাজনৈতিক মতাদর্শ, সংগঠিতভাবে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও শোষণহীন সমাজ গঠনের কথা বারবার উঠে এলেও তা কখন শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। এখানেই শিল্পী বিমল সিংহ-এর বিশেষত্ব।

তথ্যসূত্র:

১। মলয় দেব, রাজীব ঘোষঃ ২০১৪ 'সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ'
২। বিমল সিংহঃ ২০১৩ পৃ. ৩
৩। তদেবঃ পৃ ৮
৪। মলয় দেবঃ 'বিমল সিংহে'র গল্পবিশ্বে নিম্নবর্গ ও আদিবাসী জীবন' প্রসেনজিৎ দাস (সম্পা): ২০১৪ পৃ ৪৯
৫। বিমল সিংহ: ২০১৩: পৃ. ৩০
৬। বিমল সিংহ: ২০০৯: পৃ. ৩৯
৭। বিমল সিংহ: ২০১৩: পৃ. ৫৩
৮। বিমল সিংহ: ২০১৩: পৃ. ৫৩
৯। পুর্ণেন্দু গুপ্ত (সম্পা): ২০০৮: পৃ. ২৭

গ্রন্থপঞ্জি:

১। পুর্ণেন্দু গুপ্ত (২০০৮): স্মরণে শ্রদ্ধায় বিমল সিংহ, নবচন্দনা প্রকাশনী: আগরতলা।
২। বিমল সিংহ (২০১৩): বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ, ত্রিপুরা দর্পণ: আগরতলা।
৩। বিমল সিংহ (২০০৯): আলোর ঠিকানা, নবচন্দনা প্রকাশনী: আগরতলা।
৪। মলয় দেব, "বিমল সিংহ'র গল্পবিশ্বে নিম্নবর্গ ও আদিবাসী জীবন", প্রসেনজিৎ দাস (সম্পা) (২০১৪): গল্প সমীক্ষা, তুলসী পাবলিশিং হাউস: আগরতলা।
৫। মলয় দেব, রাজীব ঘোষ (সম্পা) (২০১৪): বিমল সিংহ: জীবন ও সাহিত্য, ত্রিপুরা দর্পণ: আগরতলা।